প্রথম আলো

20 MAR 2017

শিক্ষকের দুর্নীতি

খো লা হা ও য়া

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

প্রশ্নপত্র ফাঁস শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়

কিছুদিন থেকে মিডিয়ার মনোযোগে এসেছেন কিছু দুর্নীতিবাজ শিক্ষক, যাঁরা এসএসসিসহ নানা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং তাঁদের দুর্নীতি সবার উদ্বেগ ও মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছে পুরো শিক্ষক সমাজ। এক টেলিভিশন চ্যানেলের আলোচনা অনুষ্ঠানের শিরোনামই ছিল, আমার এই লেখাটির মতো—শিক্ষকের দুর্নীতি। ওই অনুষ্ঠানের বক্তাদের কথায় হতাশা ছিল, এ রকম ক্ষোভও ছিল যে শিক্ষকেরা যখন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন, জাতির প্রত্যাশার জায়গাটাতে একটা বড় ঘাটতি দেখা দেয়।

এই ক্ষোভটা সংগত। শিক্ষকতা পেশাটিকে সমাজ 'মহান', 'আদর্শিক' অথবা 'অনুকরণীয়'—এসব বর্ণনায় ভূষিত করেছে। সমাজের চোখে শিক্ষকেরা হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁরা সুনীতির চর্চা করবেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্নত চিন্তা আর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। যাঁরা এই মাপকাঠিতে পড়েন না, তাঁদের যে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করা উচিত নয়, সমাজ তাঁদের তা স্মরণ করিয়ে দেয়। একসময় শিক্ষকতা নিয়ে একটি অলিখিত সামাজিক চুক্তি ছিল। যার এক পক্ষ শিক্ষকেরা, যাঁরা তাঁদের সীমিত (অনেক ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত) আয় নিয়েও তাঁদের পেশাকে একটি ব্রত হিসেবে নেবেন; এবং অন্য পক্ষ সমাজ, যা তাঁদের সম্মান জানাবে, একটা মর্যাদার আসনে বসাবে।

সেই দিন গেছে। আমাদের চোখের সামনেই সমাজে বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গেল। পুঁজির পরাক্রমের নিচে অনেক সামাজিক চুক্তি হারিয়ে গেল। পণ্য সংস্কৃতি সর্বগ্রাসী হলো, মানুষের লোভ বাড়ল। দৃশ্যমাধ্যম এসে প্রকৃত-অপ্রকৃতের ব্যবধানটা তার নিজের মতো ঘুচিয়ে দিল। সমাজের কাছে ভেতরের সারটা থেকে বাইরের চমকটা বড় হয়ে দাঁড়াল। একসময় শিক্ষাও পণ্যে পর্যবসিত হলো। এবং পণ্যের পৃথিবীতে যেকোনো কাজ ও সেই কাজের ফলকে যেমন লাভ-ক্ষতির মূল্যে বিচার করা হয়, শিক্ষাও হয়ে দাঁড়াল লাভ-ক্ষতির একটা যোগফল বিশেষ। অল্প বিনিয়োগে অনেক লাভের আশায় শিক্ষাকে বাজারমুখী করা হলো।

অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, পরিবারগুলো সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠায় একটা মূল্যবান সনদের জন্য, ভালো মানুষ হওয়ার জন্য নয়। এখন সন্তানেরা মানবিক শিক্ষা পেল কি না, তাদের চিন্তাচেতনায় সমুন্নতি ঘটল কি না, তারা উদার মানবিকতা ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতার শিক্ষা পেল কি না, তাদের ভেতর আত্মশক্তির বিকাশ ঘটল কি না, তারা প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখল কি না, এসব নিয়ে কেউ আর ভাবেন না। পরিবারগুলোর একটাই চিন্তা—তাদের সন্তানেরা জিপিএ-৫ নিয়ে স্কুল-কলেজ থেকে বেরোল কি না (এবং সেটি যদি গোল্ডেন হয়, তাহলে তো কথাই নেই)। আমি নিশ্চিত ব্যতিক্রম আছে, প্রচুরই আছে, কিন্তু ওপরের ছবিটিকে যদি সাধারণ হিসেবে বর্ণনা করি, তাহলে নিশ্চয় ভুল হবে না।

শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষার দর্শন, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ উপায়গুলো নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন, তাঁদের সবাই একটা ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতা দেয় এবং মানুষকে মানবিক করে। এর যে জাগতিক একটি কার্যকারিতা আছে, কাজের ক্ষেত্রে এর যে প্রয়োগ আছে—শিক্ষা যে বিজ্ঞানসাধনা থেকে নিয়ে বাস্তবজীবনের শর্তগুলো পূরণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু পাশাপাশি এ-ও দাবি করেন, শিক্ষা মনটা জাগায়, তার সবগুলো জানালা খুলে দেয়। দীর্ঘদিন সমাজও এসব বিশ্বাস ধারণ করত। আমার ছেলেবেলাতেও দেখেছি, আমার শিক্ষকেরা সততার উপদেশ দিতেন, পরিশ্রমের জন্য উৎসাহ দিতেন, পড়ার চর্চাটা বাড়াতে বলতেন। এখন সেই ঐতিহ্যটা প্রায় হারিয়েই গেছে। সেটি শুরু হয়েছে শিক্ষাকে সনদ ও বাজারমুখী করার পর থেকেই।

শিক্ষা যে কতটা বাজারমুখী হয়েছে, অথবা শিক্ষাকে একটি বাজারে পরিণত করা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাগুলো তা প্রমাণ করে। আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা অথবা এসএসসি অথবা এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি, প্রশ্নপত্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ছিল একটা প্রত্যাশার এবং প্রত্যাশা না পূরণের উদ্বেগের। যার একটি সমাধান হতো পরীক্ষা শুরুর প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই। প্রশ্নপত্র ভালো হলে প্রত্যাশাটা রূপ নিত স্বস্তিতে; না হলে উদ্বেগের। প্রশ্নপত্র কারা করেন, কোথায় ছাপা হয়—এসব জানা আমাদের কাজ ছিল না। আমাদের অভিভাবকদেরও না। নকলের বিরুদ্ধে একটা কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করত। কেউ নকলের জন্য ধরা পড়লে তার পক্ষে কেউ কথা বলত না। নকলবাজের পরিবার লজ্জা পেত।

একসময় নকল করাটা আর লজ্জার বিষয় হয়ে থাকল না, এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ল। পরিবারগুলোও নকলের চর্চায় শামিল হলো। পনেরো-কুড়ি বছর আগে পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপা হতো। স্কুলের দেয়াল বেয়ে, জানালা গলিয়ে অভিভাবকেরা পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্তানদের কাছে নকল পৌঁছে দিচ্ছেন।

নকলের সেই রমরমা অবশ্য কমেছে। তবে এ জন্য কমেনি যে নকল করাটা অনুচিত, গর্হিত একটি কাজ। কমেছে কারণ, নকলের বিকল্প বেরিয়েছে। একটি বিকল্প হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস, তবে আরও বড় বিকল্প কোচিং-বাণিজ্য, গাইড বই, নোট বই। পত্রিকার প্রতিবেদন ও বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, এখন বড় কোচিং সেন্টারগুলো শতভাগ পাসের নিশ্চয়তা দেয়। বড়সড় অহংকার নিয়ে এসব বাণিজ্যিক সংস্থা জানিয়ে দিচ্ছে, শিক্ষার্থীরা যেসব স্থানে পড়ে, তাদের গোল্ডেন জিপিএ সেসব স্কুল পাইয়ে দেয়নি, দিয়েছে তারাই। শিক্ষার্থীদের সংযুক্তি স্কুলের সঙ্গে তাদের মালিকানা কোচিং সেন্টারের।

কোচিং-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে পড়ান স্কুল-কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। সেখানে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা হয় (অথবা তৈরি করা থাকে) এবং সেগুলো মুখস্থ করে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়। বড় বড় কোচিং সেন্টার নিশ্চয়তা দেয়। পরীক্ষার প্রশ্ন 'কমন' হবেই। হয়ও।

কিছু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়, অনেক প্রশ্নপত্রই কোচিং সেন্টারের তৈরি করা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে যায়। এ জন্য কোচিং-বাণিজ্য স্কুল ও কলেজের শিক্ষার বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেহেতু স্কুল-কলেজের শিক্ষায় যা বিনিয়োগ হয়, কোচিং-বাণিজ্যে বিনিয়োগ হয় তার বহুগুণ। কোচিং-বাণিজ্য এখন পাবলিক পরীক্ষাগুলোরও ঠিকাদারির দায়িত্ব নিয়েছে।

অনেক শিক্ষক এখন স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষ থেকে বেশি মনোযোগ এবং যত্ন নিয়ে পড়ান কোচিং ক্লাসে। এসব শিক্ষকদুই রকমের কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত—অনেকেই নিজের বাড়িতে, ভাড়া করা বাড়িতে অথবা স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষে ক্লাস শেষ হওয়ার পর ব্যক্তিগত কোচিং করান। অন্যরা কোচিং সেন্টারের বেতনভুক হয়ে সেই চর্চা করেন। এক খবরের কাগজের প্রতিবেদনে পড়েছিলাম, গণিত, ইংরেজি এবং বিজ্ঞানে কোচিং দিচ্ছেন—এমন অনেক শিক্ষক মাসে লাখ টাকার বেশি উপার্জন করেন। ঢাকা শহরের এক নামী স্কুলে আমার এক আত্মীয়ের সন্তান পড়ত, তাকে বাধ্য করা হয়েছিল ড্রয়িং বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকের কাছে কোচিং করতে।

ড্রয়িংয়েও কোচিং! কারণটা শিক্ষার বাজারীকরণ। এই বাজারীকরণের কারণটা হচ্ছে চাহিদা এবং সরবরাহের যোগসূত্রটি তৈরি হয়ে যাওয়া। আমরা এখন শিক্ষায় বিনিয়োগ নিয়ে ভাবি না। শিক্ষায় জিডিপির হিস্যার অনুপাতে আমাদের খরচ প্রতিবছর কমছে, এখন তা নেপালেরও নিচে। কিন্তু শিক্ষায় ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পেছনে এখন যত বিনিয়োগ, তা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে সরকারের বাজেট বরাদ্দ থেকে অনেক বেশি।

স্কুল-কলেজে শিক্ষার জন্য যত টাকা দেওয়া হচ্ছে, কোচিং-বাণিজ্যে নিশ্চয় তার থেকে বেশি বিনিয়োগ আছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা (এ দুটিকে পাবলিক পরীক্ষা বলতে কর্তাব্যক্তিরা আনন্দ পান) শুরুর আগে কোচিং-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর হিসাব অনুযায়ী ৩২ হাজার কোটি টাকা। এখন সেটি ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এবং যেহেতু এই বাণিজ্যে যাঁরা বিনিয়োগ করেন, তাঁরা মোটা অঙ্কের মুনাফা করেন, তাঁরা বিনিয়োগ ও মুনাফার নতুন নতুন জায়গা তৈরি করে নেন। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এ রকম উর্বর দুই জায়গা। এ দুই পরীক্ষা শিক্ষা-দর্শনের কোনো আদর্শ থেকে শুরু হয়নি, শিক্ষানীতির কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্যও হয়নি, হয়েছে কোচিং-বাণিজ্যের অমোঘ প্রভাবে। এখন আমরা যতই বলি, এ দুই পরীক্ষা এখন কোচিং-বাণিজ্যকে গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে গেছে, এদের চাপে শিশুরা শিক্ষার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এগুলো বাতিল করার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের দেশে ফ্লাইওভার তৈরি হয় ঠিকাদারদের স্বার্থ দেখে, স্কুলের পাবলিক পরীক্ষা চালু হয় শিক্ষা-ঠিকাদারদের স্বার্থ দেখে।

২.

শিক্ষকেরা তাহলে কেন দুর্নীতিতে জড়াবেন? একটি কথা স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো, সব শিক্ষক নয়, মোটেও নয়; তবে দুর্নীতিতে যাঁরা জড়িয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব কমও নয়। আমাদের কাছে এই সংখ্যা এক হলেও তো তা দুঃখজনক।

জড়াবেন যে, তার কারণ বাজার। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, সাম্প্রতিক বেতন বৃদ্ধির পরও অপর্যাপ্ত। তাঁদের সামাজিক মর্যাদাও তলানির দিকে, এদিকে জীবনযাত্রার মান দৃশ্যমানএবং অদৃশ্যভাবে বাড়ছে। বস্তুতন্ত্রের নিয়ম মেনে চাহিদা—প্রকৃত এবং মেকি, দুটিই বাড়ছে। চিকিৎসা এবং আবাসন ব্যয়বহুল হচ্ছে। কিছু শিক্ষক বাধ্য হচ্ছেন দুর্নীতিতে জড়াতে। অনেকেই কোচিং-বাণিজ্যে নাম লেখাচ্ছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও এক শিক্ষা গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী কোচিং-বাণিজ্যে অংশ নিচ্ছেন এ রকম শিক্ষকদের একটি বড় অংশ বলছেন, বিকল্প থাকলে তাঁরা এই বাণিজ্যে নামতেন না।

কথাটা আমিও বিশ্বাস করি। কারণ, এখনো এক বড় সংখ্যার শিক্ষক দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে, আদর্শটাকে ধরে রেখে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। বিকল্পটা দেওয়ার কথা রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের শিক্ষাচিন্তা যদি উন্নত হয়, শিক্ষাকে যে সত্যিকার অগ্রাধিকার দেয়, সেই গোড়া থেকে শুরু করে শিক্ষায় বিনিয়োগ করে যত প্রয়োজন তত এবং যদি শিক্ষাকে জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী তার কাজকর্ম সাজায়, তাহলে দুর্নীতির প্রসঙ্গটি আমাদের উদ্বেগের কারণ আর থাকবে না।

সেই দিকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।

● সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।